যাপন ভঙ্গিমা

ঋিজিৎ সেন

ভি. কে. কৃষ্ণমেনন সারাজীবন চা আর টোস্ট খেয়ে কাটিয়েছেন। অন্য কিছু প্রায় কখনোই খাননি বলা যায়। এক সংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন ---"Sir, is it a fact that you never took any thing except tea and toast?" কৃষ্ণমেনন গম্ভীরভাবে উত্তরর দেন --- "oh no! of course I sometimes had toast and tea too."

কৃষ্ণমেননের যাপন ভঙ্গিমার আরেকটি বিচিত্র উদাহরণ দেখেছিলুম ১৯৬২ সালে, ইন্টারন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফেয়ার দেখতে গিয়ে। গাড়িতে বোঝাই একঝাঁক ষ্ট্রীট আর্চিন, কৃষ্ণমেনন প্রায় উন্মাদের মত নিশুতরাতে কনট প্রেসের বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানের শাটার পেটাচ্ছেন। উদ্দেশ্য দোকান খুলিয়ে শিশুদের জন্য কাপড় কেনা।

এই কৃষ্ণমেননই আবার যখন লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য হোস্টেল চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সাথে ছাত্রদের ঠোকাঠুকি লাগে খাবারের নিম্নমান নিয়ে। এই ঠোকাঠুকি ধর্মঘট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। স্বাধীনতার ঠিক পরের ঘটনা সেটা।

কৃষ্ণমেনন অনেক দূরের মানুষ, তবে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র যাপন ভঙ্গিমা খুব কাছ থেকেও দেখেছি জীবনে। আমার ধারণা যে মানুষের মনস্তত্ত্বের কোনো একটি গোপন জায়গায় উৎপত্তি এর। জায়গাটিকে পরিভাষিত করাকঠিন। মানুষের মনের সবকটি দিক সমরূপ হয় না। সেরকম হলে তো মানুষ আর মানুষ থাকতই না, হয়ে যেত রোবোট। কিন্তু মানব চরিত্রে ব্যাখ্যার অতীত এমন অনেক কিছু চোখে পড়ে, যা আমাদের থ' করে দেয়। বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে যে এমনটা কি ভাবে হয়। ধরে নেওয়া যাক একজন মানুষের কথা, অধ্যাপক রঙীন হালদার। রাজশেখর বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু-র বন্ধু, পার্শিবাগানের বোদ্ধা আড্ডার নিয়মিত সদস্য, এ্যালানিটিক্যাল সাইকোলজি ও ফিলজফির -র ক্ষুরধার জ্ঞানী, শিক্ষাবিদ। সুকুমার সেনের আত্মজীবনী দিনের পরে দিন যে গেল তে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে তাঁর । মেধা ছিল প্রখর, সূর্যের মতো ঝলমল করত যার নাগাল পাওয়া তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবীরও সাধ্যের বাইরে ছিল। অথচ ... প্রচণ্ড শুচিবায়ু। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি, এজন্যই তাঁর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। নাঃ ! খাবারের থালায় মেয়েছেলের চুল, এ আমার সহ্য হবে না। খেতে বসার আগে বহুক্ষণ ধরে বিভিন্ন সাবান সহযোগে হাত ধুতেন, ধুয়ে আর টাওয়াল দিয়ে মুছতেন না, ঝুলিয়ে রাখতেন যাতে জলের শেষ ফোঁটাটিও ঝরে যায়। পরিশীলিত রন্ধনশিল্পী, উনুনে পুড়িং বসিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতেন যে সরটি যথার্থ পুড়ছে কিনা, প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন যে রন্ধন প্রতিযোগিতা হলে পুষেরা নারীদের চাইতে কিছু কম যাবেন না। পৃথিবীর প্রতিটি বিখ্যাত হোটেলের শেফই পুষ! অথচ শুচিবায়ুগ্রস্ত বলে যে তিনি একাকিত্ববাদী, তাও নয়। পাটনায় সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই তাঁর সোচ্চার ও দুর্বার উপস্থিতি, তা সে রবীন্দ্রজয়ন্তীই হোক বা কার্ল মার্কসের জন্মদিন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল হালদার, যাঁর পরিচিতি বাংলার পাঠককে দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। গোপাল হালদারের অবিস্মরণীয় একটি রম্য রচনা সংগ্রহ আছে, নাম আড্ডা। তাতে রঙীনবাবুর রন্ধনশিল্প নিয়ে বহু বিচিত্র তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

এ তো গেল বরেণ্য একটি মানুষের কথা, যিনি বিচিত্র যাপনভঙ্গিমা সত্বেও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন পাটনা শহরে। অন্যদিকে এমন মানুষও দেখেছি, যাঁর যাপনভঙ্গিমা প্রায় ফরাসী ছোটগল্পের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পাটনাশহরে কোন নেটিভ এস্টেটের বিবাহিতা রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে এসে উঠেছিলেন কবি চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়। হিন্দীভাষার তীক্ষ্ণধী কবি, অ

াবার অন্যদিকে জ্যোতিষশাস্ত্র, তন্ত্র এগুলোরও বিশারদ। থাকতেন অদ্ভুত একটি বাড়ীতে, পাটনা সিটীর ঘিঞ্জি গলির অনেকটা ভেতরে। অদ্ভুত বলছি এজন্য যে বাড়িঅবধি পৌছোনোর আগ বেশ খানিক টা ঝোপঝাড় জঙ্গল পেরোতে হত। ব াড়ীটি কার ছিল জানি না, তবে তার সর্বাঙ্গে গজিয়ে উঠেছিল বট অশথের চারা। বাড়ীটির দোতলায় থাকতেন চন্দ্রকান্ত ও তাঁর সঙ্গিনী। একতলা প্রায় বন্ধই পড়ে থাকতো।

মহিলা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর চোখদুটির জুড়ি আমি খুঁজে পাইনি আজও। সারা গায়ে গয়না, প্রায় নতুন বৌ - এর মতন সাজে সারাক্ষণ বিচিত্র বাড়ীটির দোতলায়, এঘর ওঘর করতেন। আমি গেলে শশব্যস্ত চন্দ্রকান্ত স্টোভ জ্বেলে নিজের হাতে চা করতেন। চন্দ্রকান্ত ছিলেন দক্ষ প্রুফ রীডার আর সম্পাদক। পাটনা শহরের পত্রিকা মহলে তাঁর চাহিদা হতেপ ারতো প্রবল, অথচ তিনি বাড়ী ছেড়ে বেরোতেনই না। সারাদিন ঐ রাজকুমারীকে আগলে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝেব াইরে থেকে তালা মেরে যেতেন রেশন আনতে। ওঁদের চলত কি করে? শোনা যায় মহিলার কাছে গয়না ছিল প্রচুর। তাই একটি একটি করে বেচে ঐ বিচিত্র সংসারটি চালাতেন চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়।

চন্দ্রকান্তের সাথে মহিলার বয়সের ব্যবধান অনেক। চন্দ্রকান্তের একমুখ দাড়ি আর দুচোখ জোড়া বিষন্নতা! আমি সেই বয়সে ছিলুম ওঁর কবিতার একাগ্র শ্রোতা। চন্দ্রকান্তের কবিতায় আশর্চ্য আর ধুলোপড়া সব বাড়ীর কথা থাকত, যেখানে অনেক কটি অবিবাহিতা মেয়ে থাকে। তাদের কোনো পুষ নেই, তাই যৌনতৃপ্তির জন্য তাদের মধ্যেই কেউ কেউ পুষ সাজে। তখনকার সামাজিক পটভূমিতে চন্দ্রকান্ত-র কবিতার বিষয়গুলো ছিল এক্সপ্লোসিভ। হ্যাঁ, চন্দ্রকান্ত-র এসব কবিতা অবশ্যই কেউ ছাপতে চাইতে না, আর ওঁরও তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

খুব স্বাভাবিক যে এভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। একদিন ঐ বাড়ীটিতে চন্দ্রকান্ত ও তার রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া য ায়। ওঁরা দুজনে একত্রে আত্মহত্যা করেন। উপাধ্যায় ও তাঁর রাজকুমারীকে পাটনা শহরে কেউ আর মনে রাখেনি। তাঁর কবিতাগুলিও সংকলিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সাহিত্যদেবী এমনিতেই বড় নিষ্কন। মেধাবী সন্তানদের ভুলে যেতে তাঁর বড় একটা সময় লাগে না। কিন্তু আমার ভিভিড্লি মনে আছে ওঁর কথা, মূলতঃ অদ্ভুত জীবনযাপনের দন।

হরিলাল কামগারের কথা এর পর বলা যেতে পারে। কামগার অর্থাৎ মজুর, যাকে মজদুর বলা হয় উর্দু হিন্দীতে। কৈশে ারে কোন এক পর্যায়ে কম্যুনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এসেছিলেন --- তারপরেই নিজের পুষানুত্রমিক পদবী ছেঁটেছুটে ফেলে উনি হয়ে যান হরিলাল কামগার। বিহার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে ক্ষুদ্র ট্রেড ইউনিয়ণ আন্দোলনটি ছিল, তার খুঁটিনা টি যত হ্যাপা, পোয়াতেন হরিলাল। শুনেছি উচচবিত্ত কায়স্থ পরিবারের ওঁর জন্ম, যারা রাজ্যনীতি, ব্যুরোত্রাসি ইত্যাদিতে রীতিমত ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু এই জাতটি আবার ভয়ানক রকম কম্যুনিস্ট বিদ্বেষীও বটে। হরিলালের সাথে সবরকম স ম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। হরিলাল সেসব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে জীবন কাটানোই ছিল তাঁর পছন্দ। সারাদিন কাজ, পার্টির মেসে খাওয়া আর যে কোন একটা তক্তাপোষে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়া রাত্তিরে। পার্থিব সম্পত্তি বলতে একটা হোল্ডঅল, একটি ছোট টিনের বাক্সো আর পড়ে পড়ে শতচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দু একটি বই যেমন কম্যুনিস্ট ম্যানিফোস্টো, দ্য স্টেট এ্যাণ্ড রিভলিউশন। মাঝে মাঝে কেউ জামাকাপড় কিনে দিতে, নতুন একটা চশমা কিনে দিত - তাতেই মহাখুশী। হরিলাল কেবল পার্টির কাজে লাগতে চাইতেন। আমরা রাত্তিরে স্টুডেন্ট্ফেড ারেশনের তরফে পোস্টারিং করছি, হরিলাল আমাদের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য রয়েছেন সাথে। মহিলা সমাজের প্রতিবাদ মিছিল রেরোচ্ছে, হরিলাল হাঁটছেন সাথে সাথে। শান্তি আন্দোলনের সেমিনার, তাতেও বসে আছেন অডিয়েন্সে। নেশা বলতে কোন কিছু ছিল না, সামান্য একটু মৌরী চিবোনো ছাড়া। সেটুকুও সযতনে সংগ্রহ করে রাখতেন একটি ছোট্ট ডিবেয়।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, খুবই কষ্ট পান হরিলাল শেষ জীবনে। কিশোর হরিলাল যে পার্টিকে দেখেছিলেন, কালত্রমে তা বারোভূতের কারবার হয়ে ওঠে। হরিলালের অবস্থা হয় পুরোনো আসবারের মত, যা ফেলে দেওয়া যায় না, কেবল ব াড়ীর এ ঘর থেকে ও ঘর চালান করা হয়। হরিলালের চোখদুটি প্রথমে নষ্ট হয়, তারপর তারই দন তাঁর চলাফেরা একেব ারেই সীমিত হয়ে পড়ে। বি. পি. টি. ইউ. সি অফিস থেকে তাঁকে চালান করা হয় পার্টির রাজ্য দফতরে। সেখানে লাঠি ঠকঠক করে ঘরে ঘরে ঘোরেন। নয়া জমানার ঝা - চকচকে পার্টি এ্যাপারিচিকিরা তাঁকে সামান্যতম সময় দিতেও নারাজ ! হরিলালাও তাঁদের বেশী ট্রাব্ল্ দেন না, টুক করে মরে যান একদিন, রাত্তিরে ঘুমের ভিতরে। হরিলালের মারা যাওয়া

বা দাহ সংস্কারের সময় আমি নিজেই উপস্থিত ছিলাম না, তবে শুনেছিলাম অসম্ভব বিরক্ত করে তাঁর রক্তের আত্মীয়রা এসেছিলেন। মুখে আগুন টাগুনও দিয়েছিলেন তাঁরাই, যার একটা সূক্ষ্ম কারণ ছিল। পুষানুক্রমিক সম্পত্তিতে অকৃতদার হরিলালের একটা মোটা অংশছিল। শেষকৃত্য যে করবে,উত্তরাধিকারও বর্তাবে তারই। না, হরিলালের রক্তের আত্মীয়দের হিন্দুত্ব চাগিয়ে উঠেছিল মনে করার কোন কারণ নেই।

হরিলালের গোটা জীবনটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর ভালোবাসার মধ্যে কোথাও একটা উত্তীয় গোছের ব্যাপার ছিল (রবীন্দ্রনাথের পরিশোধ দেখুন) একতরফা ভালোবেসেই তৃপ্ত ছিলেন তিনি, বিনিময়ে কি পেলেন কি পেলেন না, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন একেবারেই ছিলেন না। শেষবয়সেও তাঁর মধ্যে বিরক্তিবা তিক্ততা দেখিনি। এই এ্যাটিচিউডটি অবশ্যই অ-মার্কসীয়, তবে হরিলালের বিচিত্র জীবন, ততোধিক বিচিত্র যাপনভঙ্গিমা --- এগুলির পটভূমিতে তাঁকে এ যুগের উত্তীয় মনে করে নিতে কোন দ্বিধা হওয়ার কথা নয়।

এই স্বভাবের আরএকজনকে দেখেছি জীবনে। হরিলালের সাথে তুলনা করব না, তবে তিনিও ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। একেবারে নিরক্ষর গ্রাম্য যাদব পরিবারের সন্তান। অত্যন্ত ছেলেবয়সে, খগোল রেলওয়ে কলোনীর একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারে ঘরের ফুটফরমাস খাটার লোক হয়ে এসেছিলেন। বাড়ীর কর্তা মি. জোসেফ রেলওয়ের টিকিট চেকার -- দুহাতে পয়সা কামাচ্ছেন। মিসেস জোসেফ ডায়নাপো ক্লাব বা দানাপুর ক্লাবের উৎসাহী মহিলা স্বেচ্ছাকর্মী। ফুলের মত ফুটফুটে দুটি মেয়ে বাসে চড়ে পাটনায় সেন্ট জোসেফ্স্ কনভেন্টে পড়তে যায়।

এর মধ্যেই দুম্ করে একদিন মি. জোসেফ মারা গেলেন। রোগটা কি ছিল, বলা কঠিন। সম্ভবতঃ রক্তের উচ্চচাপ। তখনকার উচ্চবিত্ত রেলকর্মীদের মত মি. জোসেফেরও অবসর সময়ে বোতল নিয়ে বসার অভ্যেস ছিল। এও শুনেছি, মাত্রা ছাড়াতেন তিনি প্রায়ই। সে যাই হোক, এর পরেই পরিবারটি একেবারে নোঙরছেঁড়া হয়ে পড়ে। সর্বোপরি তাদের দিকে এগিয়ে আসে বেশ কয়েকটি লোভী থাবা। মিসেস জোসেফের তখন ভরাযৌবন, মেয়ে দুটিও শৈশব থেকে কৈশোরের দিকে। কলোনীর পাট চুকিয়ে জোসেফ সাহেবের পরিবার আশ্রয় নেয় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়, একটি ছোট্ট বাসা ভাড়া করে। ক্যান্টনমেন্টের পরিবেশটি পরিচ্ছন্ন। ওখানে পরিবারটি মোটামুটি "থিতু" অবস্থাপায়।

সেই যাদব কিশোরটি, যে জোসেফ সাহেবের পরিবারে ফুটফরমাস খাটতে এসেছিল -- এবার একটি অন্যতর ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হয়। সে হয়ে ওঠে জোসেফ পরিবারের রক্ষক। জোসেফ সাহেবের স্ত্রীকে বলত মা - জী। যথার্থ মা - জী জ্ঞানেই সে এবার তাঁর ও তাঁর কন্যাদের একনিষ্ঠ সেবক হয়ে ওঠে। মিসেস জোসেফকে হাটে বাজারে বেরোতে দেবে না সে কন্যাদেরও নয়। সব্জী কেনা, রেশন তোলা, সব নিজের হাতে করবে, পাওনাদার সামলাবে, গুণ্ডা অথবা উটকো আগ্রহী তাড়াবে। রাত্তিরে শুয়ে থাকবে জোসেফ পরিবারের বসার ঘরে কার্পেটটির ওপর , কি শীত কি গ্রীষ্ম। মেয়েদের স্কুলের পড়া নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খবরদারী করবে। প্রাইভেট টিউটর ঠিক করবে, তারসাথে দরদস্তুর করবে, মাসোহারা ঠিক করবে, জোসেফ সাহেবের অকালমৃত্যুর ফলে যে মোটা টাকাটি রেল দিয়েছিল, তার একটি ভালোরকম অংশ সে হস্তগত করেছে। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, লোকটির কোথাও কোন জমিজমা, ভূ - সম্পত্তি নেই। একেবারেই হতদরিদ্র তার গ্রামের পরিবার। কেউ কেউ আবার মিসেস জোসেফের সাথে তার দৈহিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। পরে জেনেছি, এটাও কুৎসা। মিসেস জোসেফ কে যথার্থই মনিবানী মনে করত রামবরণ, এই যাদব ভৃভ্যটি। তাকে মনে মনে বসিয়ে রেখেছিল দেবীর আসনে। চোখ তুলে মিসেস জোসেফের দিকে তাকাতেই পারত না, এমন ছিল তার সম্ভ্রম। মা - জী সম্বোধন ছাড়া কথা বলত না। আর মিসেস জোসেফও সাধারণ মহিলা ছিলেন না। তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ছিল খুবই উঁচুদরের। একমাত্র "যীশু"র প্রতি সৎ থাকাটাতে জাগতিককর্তব্য বলে মনে করতেন।

তবে ব্যাপারটি যথার্থ রসিকতার পর্যায়ে পৌঁছায় মিসেস জোসেফের দুই কন্যা মার্গারেট আর ডরোথী বয়স্থা হয়ে ওঠার পর। এ্যংলো ইণ্ডিয়ান যুবতী, তদুপরি আগুনপারা সুন্দরী, তাদের বেশ কটি এ্যাডমায়ারার জুটে যায়। রামবরণ কিছুতেই তাদের প্রেম করতে দেবে না। যেই কোন এলিজিব্ল্ যুবক তাদের কারোদিকে এগোবে, মহা - উপস্থিতির মত মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়বে রামবরণ, হেঁটো ধুতি, ময়লা ফতুয়া, গামছা ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে। তার বক্তব্য, সে নিজে দেখে, বুঝে শুনে, মেয়েদের পাত্রস্থ করবে। প্রেম, ডেটিং এগুলো আবার কি ? ছিঃ বিহারের সমাজে এগুলো প্রচলিত নয়। লোকে কি বলবে ? জোসেফ সাহবের নামে বদনাম হবে না ? হ্যাঁ, বিয়ে তাদের ক্রীশ্চানঘরেই হবে, তবে দেখে শুনে বাজিয়ে নিয়ে পাত্র

ঠিক করবে রামবরণ।

মি. জোসেফের কন্যাদের এগুলো বরদাস্ত করার কথা নয়। তারা তদ্দিনে সাবালিকা, নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে, একজন সরকারী স্কুলে শিক্ষিকা, অন্যজন রেলওয়েতেই চাকরী পেয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে রামবরণের। এখন তাদের হাটবাজার করা, পাওনাদার সামলানো, এগুলোর জন্য আর রামবরণের দরকার নেই। তারা নিজেরাই যথেষ্ট!

জোসেফ পরিবারকে ছেড়ে রামবরণ সেই যে চলে যায়, আর ফিরে আসেনি। "He was too much interfering." জোসেফ সাহেবের কোন এক কন্যা আমাকে বলেছিলেন। সে কোথায় গেল, ভাঙামন নিয়ে গ্রামেই ফিরে গেছে কিনা জানা নেই। জোসেফ পরিবারে সমৃদ্ধি দিনে দিনে বেড়েছে। দুই মেয়েরই ভালো বিয়ে হয়েছে, তাঁরা নিজেরাও কমবিচক্ষণ ছিলেন না। কাঁদে গামছা, পরনে ধুতি আর ময়লা ফতুয়া, খালি পা আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গৃহভৃত্যটিকে মনে রাখার কোন কারণই ছিল না। তবে রামবরণের কথা মনে হলেই আমার মিসেস জোসেফের বসার ঘরটি মনে পড়ে। সেখানে কার্পেটের ওপর শুয়ে জীবনের সুবর্ণ সময় কাটিয়ে দিয়েছে লোকটা। অথচ কিসের জন্য? সে যা করেছে, তার তিলমাত্র প্রতিদানও কি পেয়েছে? না কেবল সেবাতেই নিহিত ছিল তার আত্মার আনন্দ?

অধ্যাপক রঙীন হালদার, চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়, হরিলাল কামগার, রামবরণ যাদব --- এঁদের বিচিত্র যাপন ভঙ্গিমা দেখেছি খুব কাছ থেকে, প্রায় দিনের পর দিন। অত কাছ থেকে নয়, তবু এমন একজন মানুষের যাপনভঙ্গিমাও দেখেছিলাম, যা আমাকে ভালোমত নাড়া দিয়েছিল। এই লেখাটির পরিশেষে তাঁর কথা না বললে বেইমানি করা হবে বিষয়টির প্রতি তো বটেই। আমি বিস্মিত যে তাঁকে নিয়ে কোথাও কিছু লেখা হয়নি, কারণ হিন্দী সাহিত্যিকপত্র পত্রিকা আমি দেখে থাকি নিয়মিত। আজকাল পাটনার হিন্দী দৈনিকগুলিতে যে যুব - লেখকেরা হরেকরকম ফিচার, স্টোরি ইত্যাদি করেন অবহেলিত বিষয় বা মানুষজনদের নিয়ে, সেগুলোর মধ্যেও কোথাও তাঁর উল্লেখ নেই। মানুষটি তাঁর সাবেক বাসস্থানেই আছেন কিনা, কেমন আছেন তাও জানি না।

তিনি একজন কুমোর। না, মৃৎশিল্পী - টিল্পী নয় -- একেবারেই কুমোর। সারাদিন চাক ঘোরান, খুরি, সোরাই, কলসী, সরা ইত্যাদি বানান। গ্রামীন অর্থনীতির একেবারে নিম্নতম ধাপের মানুষ। মাটির বাসনপত্র বানিয়ে যা রোজগার হয় তাই দিয়ে দিন গুজরান। স্ত্রী আর দুটি ছেলে। তাঁরাও হাত লাগাল। মাটি ভেজানো, ছানা, তাল করা ইত্যাদিতে তাঁদেরও শ্রম নিয়েজিত হয়।

অথচ মানুষটি কবি। শুধু কবি নয়, শক্তিশালী কবি। লেখার ভাষা মগহী। বিষয় কৃষ্ণ আর রাধার প্রেম। এই প্রেম নিয়ে সারাজীবন খাতার পর খাতা লিখে চলেছেন মানুষটি। প্রকাশ লিপ্সা নেই, নাম বা যশের আকাঙ্খা নেই। যে গ্রামে তাঁর বসত, সেখানেও খুব কম লোকেই জানে যে তিনি কবি এবং উঁচুদরের কবি। কেউ শুনতে চাইলেশোনান, না চাইলেও সমস্যা নেই। জোর করে ধরে শোনানোর কোন ব্যাপারই নেই। আর একটা ব্যাপার, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তিনি যত যা কিছু লিখেছেন, সব নিখুঁত হাতের লেখায় খাতাবন্দী অবস্থায় রয়েছে তাঁর ঘরের একটিসস্তা কাঠের আলমারীতে। তাঁর স্ত্রী পুত্ররাও জানেন যে তিনি কবি, তবে তা নিয়ে বিরক্তি বা অত্যুৎসাহ কোনটাইতাঁদের নেই। তিনি লেখেন, ব্যাস ল্যাঠা চুকে গেল। ওটা যেন একটা স্বাভাবিক কাজ, মাটির বাসন বানানোর মতই। এই কাজেও তাঁরা হাত লাগান। মাঝে মধ্যে খাতাগুলো বের করে রোদ্দুরে দেন, খাতার পাতায় পাতায় নিমপাতা গুঁজে দেন, যাতে পোকা না লাগে।

আসলে খুব কমবয়সে মার্কসবাদের হুদো হুদো বই পড়ে ফেলার দণ আমি যে একজন কপালপোড়া নাস্তিক। ভারতীয় কোন কিছুকেই সম্ভ্রম করতে শিখিনি। কমবয়সে ঠাকুমা - কে নিয়ে হরিসভার কীর্তন শুনতে যেতুম, লোকের ভক্তি - উন্মাদনা দেখে ভণ্ডামি মনে হত, হাসি পেত রীতিমত। পরে, কম্যুনিজ্‌মের নানা বিপর্যয়ের পর মস্তিষ্কের ধোঁয়াশা একটু একটু কাটতে শু করে, তবু তখনও কৃষ্ণ বাস্তবে কেউ ছিলেন কি না এই নিয়ে মনে নানা কূটকচাল! ওই মানুষটিকে দেখে কিন্তু দস্তরমত নাড়া লাগে মনে। আকাঙ্খা নেই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই একঘেয়ে কাজ! অথচ তার মধ্যেই সহসা ছিটকে ওঠে হীরকখণ্ডের মত আশ্চর্য দ্যুতিময় সব পংক্তি - ভাষা মহগী অথচ নির্ভুল। লেখা কবিতার সমস্ত শর্ত মেনে। হাতের লেখা নিখুঁত, কোথাও একটিও বানান ভুল নেই। কে তাঁকে যোগান দেয় এই শক্তি, এই অদ্ভুত তাগদ ? আর, নিষ্ঠা ! ছাপার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ নেই, অথচ সারাজীবনে লেখা একটিও পংক্তিকে নষ্ট হতে দেননি তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ। তাঁর লেখা কবিতাগুলি, পদগুলি, দোহাগুলি নশ্বর কাগজ নয়, ঈশ্বরের রূপ যেন। ওই খাতাগুলিই ঈশ্বর

ওই ছোট্ট পরিবারটির।

নিজেকে বহুবার প্রশ্ন করেছি জীবনে -- ভারতবর্ষ কোথায়? ভারতবর্ষ কি ? কোথায় নিহিত তার বেঁচে থাকার রহস্য? মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, বন্যা, খরা, সবকিছু উজিয়ে বারবার যে সে ফিরে আসে জীবনের উপকূলে তার চিরহরিৎ যাপন ভঙ্গিমায় -এর মন্ত্রটি কি ? ইতিহাসের বইয়ে খুঁজেছি, অনুসন্ধান নামায়, তাবড় তাবড় সেমিনারের থিম্ পেপারে। কথা বলেছি সমাজকর্মীদের সাথে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড বিপ্লবীর সাথে রাতের পর রাত মেতেছি তর্কে। সবশেষে মনে হয়েছে কিছু একটা অধরা রয়ে গেল, কিছু একটা রয়ে গেল যাকে ছোঁয়া বা পরিভাষিত করা গেল না।

তাকে একবার মাত্র ছুঁতে পেরেছিলাম পাটনা থেকে রাজগীর যাওয়ার পথে, এক অজ্ঞাত অখ্যাত নিস্তরঙ্গ গ্রামে, শীতের দুপুরবেলা কুমোরের চাকের পাশে বসে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com